এডুকেশন ওয়াচ প্রতিবেদন ২০১৪

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণী পরীক্ষা কোন পথে?

একটি নিরীক্ষা

মূল প্রতিবেদনের সহজ ভাষ্য

সম্পাদনা: শফি আহমেদ

মূল প্রতিবেদন

রমীর রঞ্জন নাথ, আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

মনজুর আহমদ, রাশেদা কে, চৌধুরী

প্রকাশনায়

গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৫

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ছবি
গণসাক্ষরতা অভিযান ও সহযোগী সংগঠন

প্রচ্ছদ
নিত্ত চন্দ্র

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০০১২-৩

যোগাযোগ ঠিকানা
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১-৩২, ৫৮১৫৩৪১৭
ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২, ইমেইল: info@campe.org
ওয়েবসাইট: www.campe.bd

মুদ্রণে
ম্যাসিভ
১১০, আলিজা টাওয়ার, ৩য় তলা, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ভূমিকা

শিশু শিক্ষার্থীরা স্কুলে যায়। অনেকেই এই স্কুলে যাওয়া বেশ উপভোগ করে। তাদের পড়ার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে নানারকমের বই নির্বাচন করে দেয়া হয়। শিক্ষা নিয়ে, সমাজ নিয়ে, দেশের উন্নতি নিয়ে যারা ভাবেন, তারা অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করেন, কী কী বিষয় থাকবে পাঠ্যবইয়ে। শিক্ষকরা সেসব বিষয়ে পাঠদান করেন। কিন্তু শিশু কেমন শিখছে, সে নিয়ে তো সবার মনে আগ্রহ থাকেই। এমনকি যে ব্যক্তির ছেলে বা মেয়ে অমন শিক্ষার্থী নয়, তারও আগ্রহ থাকতে পারে। যাঁরা সচেতন মা, বাবা বা অভিভাবক, তারা শিশুর পড়াশোনার নিয়মিত খোঁজখবর নিয়ে বুঝতে পারেন, শিশুরা কেমন শিখছে কিছুটা বা অনেকটা। কিন্তু অনেক মা- বাবা বা অভিভাবক হয়ত অতটা সচেতন নন।

আবার এটাও তো জানতে ইচ্ছে করে যে, অন্য সবার তুলনায় আমার শিশুর অবস্থা কেমন, সে কি একটু এগিয়ে না পিছিয়ে। সব দিক বিচারে এমন একটা মূল্যায়ন জরুরিও বটে। খুব স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নের ধারণাটা এখান থেকেই এসেছে। সব সমাজেই আদিকাল থেকে এর চল আছে। এটাকেই আমরা পরীক্ষা হিসেবে জানি। আবার বছরের মাঝামাঝি বা সাম্প্রতিক কালে প্রতি চার মাস অন্তর পরীক্ষা নেবার ব্যাপারটাও বেশ জনপ্রিয়। কোন শিশুর দুর্বলতা দেখতে পেলে বা যদি দেখা যায় কোন শিশু প্রায় সব বিষয়ই ভালভাবে শিখেছে, কিন্তু দু'একটি বিশেষ জায়গায় ঘাটতি রয়ে গেছে, তখন পরীক্ষার ফল দেখে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া যায়। পরীক্ষা নেয়ার মূল্যটা এখানেই।

পরীক্ষার ফল দেখেই আমরা বুঝি, কে খুব ভাল, কেউ ভাল কিন্তু অতটা নয়, কেউ আবার মাঝারি মানের এবং কেউ দুর্বল, শিশুদের এভাবেই আলাদা করা হয়। অবশ্য শিক্ষা ও শিশুর বিকাশ নিয়ে যারা ভাবেন বা কাজ করেন, তারা অনেকেই পরীক্ষা ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেন না। কেউ কেউ মনে করেন, পরীক্ষা শিশুর পড়াশোনার আনন্দ ও আগ্রহ অনেকটা মাটি করে দেয়। এ নিয়ে তর্কবিতর্ক বেশ জোরালো। পৃথিবীর অনেক দেশেই একটা বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা নেবার কোন রেওয়াজ নেই। শ্রেণীশিক্ষকের মূল্যায়নকেই গুরুত্ব দেয়া হয়।

বয়স কতটা হলে শিক্ষার্থীর জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত সেই বিষয়টার কোন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত নেই। যাই হোক, বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণি

থেকেই স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা নেবার রীতি গড়ে উঠেছে। স্কুলের শিক্ষকরাই তা পরিচালনা করেন। ইংরেজী মাধ্যম ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে এই পরীক্ষা প্রায় ভয়াবহভাবে কড়াকড়ি একটা বিষয়। দুনিয়া জুড়ে দু'টি মূল্যায়ন রীতির প্রাধান্য রয়েছে। এর একটি হল: আন্তর্জাতিক শিক্ষা মূল্যায়ন কর্মসূচি (Programme for International Student Assessment: PISA) এবং আন্তর্জাতিক গণিত ও শিক্ষার গতিপ্রকৃতি (Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS)। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বর্তমানে ৭৫টিরও বেশি দেশ যুক্ত।

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সারা দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা মূল্যায়নের রীতি দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। সাধারণ মানুষের কাছে তা পাবলিক পরীক্ষা হিসেবে পরিচিত। দশম শ্রেণীর শেষে স্কুলের শেষ পরীক্ষা, এটা সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট বা এসএসসি নামে পরিচিত। অন্যটি হল দু'বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় শেষে, হায়ার সেকেন্ডারী সার্টিফিকেট বা এইচএসসি পরীক্ষা। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠশেষে প্রাথমিক স্তরের অপেক্ষাকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটা জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চালু ছিল, যাকে বলা হত বৃত্তি পরীক্ষা। স্কুলের শিক্ষকগণের দ্বারা বাছাইকৃত শিক্ষার্থীরা তাতে অংশ নিত। অবশ্য এতে শিশুদের মধ্যে এক ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হত।

২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী বা পি-এস-সি নামে সারা দেশে একই প্রশ্নমালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য পাবলিক মূল্যায়ন পরীক্ষা শুরু করা হয়। প্রথম দিকে এনিয়ে বিদ্যালয়গুলিতে, শিক্ষার্থীদের বাড়িতে এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে খুবই উচ্ছ্বাসের প্রকাশ লক্ষ করা গেছে। খবরের কাগজ ও টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত রিপোর্টে দেশব্যাপী একটা উৎসবের আমেজের কথা জানতে পারি আমরা। বিষয়টার মধ্যে ভালোর দিকটাই বেশি দেখা গিয়েছে। পড়ার চাপের চেয়ে মনে হয়েছেপরীক্ষার্থীরা অনেক বেশি উপভোগ করেছে প্রাতযোগিতার উত্তাপ। অভিভাবকদের মুখে- চোখে আনন্দের ভাবটাই দেখা গিয়েছিল বেশি।

কিন্তু দু'-তিন বছর পর থেকেই এই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে ভিন্নরকমের প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠতে দেখেছি আমরা। তারপর ধীরে ধীরে এটা নিয়ে তৈরি হওয়া কিছু সংকট আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। এই দশ থেকে বারো বছর বয়সী পরিক্ষার্থীরা আনন্দে খুশি হওয়ার চেয়ে পড়াশোনার চাপের দাপটে বেশ হাঁফিয়ে উঠল। সমাজের নানারকমের গর্হিত সংক্রমণ এই পরীক্ষা ব্যবস্থার গায়ে কালির ছোপ লাগিয়ে দিল। তখন পুরো বিষয়টা নিয়ে এডুকেশন ওয়াচ গোষ্ঠীর ভাবনা নতুন করে বিচার- বিবেচনার প্রশ্ন সামনে চলে এল।

২০০৯ সালে শুরু হওয়া এই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ২০১৪ সালে ছয় বছর শেষ করেছে। তাই **এডুকেশন ওয়াচ** থেকে ঠিক করা হয় যে, এখন একটা সময় এসেছে, যখন ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। শিক্ষক এবং এই ব্যবস্থা পরিচালনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা জানা যাবে। এবং এজন্য বিভিন্ন খবরের কাগজ ও গণমাধ্যমে যেসব সংবাদ বেরিয়েছে সেগুলো পর্যালোচনার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। **এডুকেশন ওয়াচ**- এর বর্তমান এই গবেষণা সাধারণভাবে সমাজে নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে একেবারে প্রথমে যে উচ্ছ্বাস ছিল, তা কেন ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে গেল, **এডুকেশন ওয়াচ-** এর সবশেষ এই গবেষণায় তা বোঝা এবং বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে । আর যেটাকে বলি দিনশেষের ফলাফল, মানে আসলে শিক্ষার্থীরা কতটা শিখল, ঠিক যেমনটি সমাজের আশা বা যতটা ঠিকভাবে জানলে তারা পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষায় যোগ্যতার পরিচয় রাখতে পারবে, এসব প্রশ্ন **এডুকেশন ওয়াচ** দলের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। সেসবের কিছু উত্তর খোঁজা তার এবং উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

একেবারে শুরুতেই আমরা একটা নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার বিষয়ে যখন সমালোচনার কিছু কিছু কথা শোনা গেছে, তখন অনেকেই বলেছেন যে, আমরা স্বাধীনতার পর প্রথম যে শিক্ষানীতি পেলাম এবং যেটা নিয়ে আমরা বেশ গর্ব অনুভব করি, সেই প্রধান দলিলে তো প্রাথমিক স্তরে সমাপনী পরীক্ষা নেবার কোন কথা নেই। এমনকি শিক্ষানীতি প্রণয়নের সঙ্গে খুব সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, এমন নামী- দামী ব্যক্তিরাও এই বিষয়টার প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। দেখে নেয়া যাক, শিক্ষানীতিতে কি আছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সম্পর্কে নির্দেশনা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে আপাতত জু-নিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

একই সঙ্গে আর একটা তথ্যও সকলকে জানানো জরুরি। সার্ক অঞ্চলে বা দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চ- মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষা নেবার যে পদ্ধতি প্রচলিত

আছে, সেটা তো আমাদের জন্যও প্রাসঙ্গিক। কারণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দিক থেকে এই অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপক মিল রয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের মত আর কোন দেশে এত বেশি বার পাবলিক পরীক্ষা নেবার রীতি নেই। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে তা চার বার। শুধু প্রতিবেশী নেপালে সেটা তিন বার। অন্য সব দেশে দু'বার। চিত্রটাকে একটা ছকের মাধ্যমে বুঝে নেয়া যেতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ায় পাবলিক পরীক্ষার চিত্র

দেশ	শ্রেণি			
	পঞ্চম	অষ্টম	দশম	দ্বাদশ
আফগানিস্তান			✓	✓
বাংলাদেশ	✓	✓	✓	✓
ভুটান			✓	✓
ভারত			✓	✓
মালদ্বীপ			✓	✓
নেপাল			✓	✓
পাকিস্তান		✓	✓	✓
শ্রীলংকা	বৃত্তি পরীক্ষা		(একাদশ)	(ত্রয়োদশ)

সুত্রঃ সংশ্লিষ্ট দেশের মন্ত্রণালয় এবং ইউনেস্কো ২০১২

পটভূমি

পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রায় সব দেশেরশিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরীক্ষার উদ্ভব হয় বহু শতাব্দী আগে, তাও আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থাগুলো নিজস্ব প্রয়োজনে পরীক্ষাব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে আপন করে নিয়েছে। পরীক্ষা কেবলমাত্র বিদ্যালয় কিংবা জাতীয় পর্যায়েই আয়োজন করা হয় না। আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত পরীক্ষাও ক্রমবর্ধমানভাবে বিস্তারলাভ করছে।

আমাদের দেশে মা-বাবারা সাধারণভাবে যে বিষয়টির প্রতি বেশি আগ্রহী তা হলো, তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয় থেকে কী শিখছে? অন্য অর্থে পরীক্ষায় কেমন করছে। শিক্ষাসংক্রান্ত অংশীজনরাশিক্ষার মান নিয়ে আগ্রহী, কখনো কখনো উদ্বিগ্ন। এদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের মত প্রকাশের মানদ- হলো পরীক্ষার ফলাফল। শিক্ষাব্যবস্থার মান মূল্যায়নের যে নানা ধরনের কাঠামো ও প্রথা প্রচলিত রয়েছে সেগুলোতেও পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত। যদিও সেগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে এবং সেগুলো কীভাবে বিদ্যালয় পর্যায়ে কাজ করছে তাও দেখা হয়।

জাতীয় বা আন্তর্জাতিকযে কোনো পর্যায়েই হোক পরীক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষার্থী মূল্যায়নের বহুবিধ ব্যবস্থার ভালো ও মন্দ দিক নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রথা শিখনের ক্ষেত্রে কী মূল্য যোগ করছে, তার ভালো-মন্দও এই বিতর্কের অংশ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাবিদরা মৌলিক যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেন তা হলো, কোন বয়স থেকে শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক সর্বজনীন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া উচিত। পৃথিবীর বেশিরভাগ শিক্ষাব্যবস্থায়ই বিদ্যালয়ে ১০ বছরের শিক্ষা গ্রহণের আগে নিজ বিদ্যালয়ের বাইরেকোনো সর্বজনীন পরীক্ষা অনুমোদন করে না। কোনো কোনো দেশেএ ধরনের পরীক্ষা রয়েছে আরও পরে। অনেক দেশ নিচের শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চমানের প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষা থেকে সরে যাচ্ছে। কারণ, দেখা যাচ্ছে এগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য যতটা না উপকারী, শিখনের প্রেক্ষাপটে তার চেয়ে বেশি অপকার বয়ে আনছে।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে দুটি সর্বজনীন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। একটি দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করার পর, অন্যটি দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাসমাপ্তির পর। এগুলো যথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নামে পরিচিত ছিলো। সরকার ২০০৯ সাল থেকে দুটি নতুন সর্বজনীন পরীক্ষা চালু করেছে– একটি পাঁচ ও অপরটি আট বছরের শিক্ষা জীবন অতিবাহিত হওয়ার পর। যদিও প্রায় সব অংশগ্রহণকারীই এসব পরীক্ষায় পাশ করে, তবুও শিক্ষাবিদরা এসব পরীক্ষার যৌক্তিকতা ও এগুলো শিশু–কিশোর শিক্ষার্থীদের জীবনে কী মূল্য সংযোজন করছে তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করছেন। প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত হওয়ার পর মাত্র ১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য যে সর্বজনীন পরীক্ষার আয়োজন করা হয় তা নিয়ে তাদের সবচেয়ে বেশি আপত্তি। যে পদ্ধতিতে এই পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং এর পরম্পরায় শিক্ষার্থীদের জীবনে কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে তা নিয়েও শিক্ষাবিদদের মধ্যেউদ্বেগ রয়েছে।

গবেষণার নির্দিষ্ট বিষয়, পরিধি ও পদ্ধতি

নানারকম প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার বিষয়ে জটিল কিছু প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষত গণমাধ্যমে তার ব্যাপক প্রচার আমরা দেখতে পেয়েছি। শিশুদের উপর পড়াশানার চাপ সামাল দিতে অভিভাবকদের হাঁসফাঁস অবস্থা। কম সময়ে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে সঠিক যোগ্যতার পরিমাপটা হচ্ছে কি না, এমন সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে সমাজে। তাই এডুকেশন ওয়াচ গবেষণা দল বেশ কয়েকটি বিষয়ে অনুসন্ধান চালানোর চেষ্টা করে। সেগুলো এরকম:

- সমাপনী পরীক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিপূর্ণ মতামত,
- শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চোখে সমাপনী পরীক্ষা,
- পরীক্ষার ওপর গণমাধ্যমের প্রতিবেদন ও প্রতিক্রিয়া,
- শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য বিদ্যালয়গুলোর উদ্যোগ,
- সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতিতে শিক্ষার্থীদের পরিবারের সাড়া,
- সমাপনী পরীক্ষা পরিচালন পদ্ধতি,
- সার্বিকভাবে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষা ও অতিরিক্ত পাঠের জন্য ব্যক্তিখাতে খরচ এবং
- সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ও এর সঙ্গে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের সম্পর্ক।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এখন দেশের সবচেয়ে বড় সর্বজনীন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ২০১৪ সালে যত পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল তা একই বছরের নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনী (জেএসসি)পরীক্ষার্থীরসংখ্যার ১.৫৫ গুণ, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার (এসএসসি) পরীক্ষার্থী সংখ্যার ২.৪৭ গুণ এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার্থীর সংখ্যার ২.৯৩ গুণ।

বৈজ্ঞানিকভাবে সঙ্গত কারণে গবেষণার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবক, যাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে গবেষণা কাঠামো তৈরি হয়েছে, তাঁরাও এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যুক্ত। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে যেসব কর্মকর্তা যুক্ত তাঁদের কাজও এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে। গবেষণায় পাঁচ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশেরপ্রাথ মিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ এই ধরনের বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কিন্ডারগার্টেন
উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
এবতেদায়ি মাদ্রাসা

আমাদের দেশের শহর ও গ্রাম এলাকার নানা ধরনের পার্থক্য আছে সুবিধাগত বিষয়ে। স্বাভাবিক কারণেই গবেয়ণায় দুই ধরনের এলাকা নেয়া হয়েছে। প্রথমে ১৫০টি উপজেলা এবং পৌরসভা বেছে নেয়া হয়। গ্রাম এলাকার ৭৫টি উপজেলা এবং একই সংখ্যার অর্থাৎ ৭৫টি পৌরসভা। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং গবেষণারজন্য নির্বাচিত এলাকার এনজিওদের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের তালিকা নেয়া হয়। গবেষণার জন্য বিদ্যালয় নমুনায়ন করা হয়েছে।উপজেলাগুলো থেকে পাঁচ ধরনের মোট ৫৭৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়, এর মধ্যে ৩২৬টি গ্রামীণ এলাকা থেকে ও ২৫২টি শহর এলাকা থেকে।

সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পরিবারের বাইরে শিক্ষা- প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানা রকমের তৎপরতা থাকে। সেগুলো কেমন, কত সময় ধরে চলে, কিভাবে পরিচালিত হয়, পবেষণার জন্য তা জানা অত্যন্ত জরুরি। এ জন্য নানা বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আগেই অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর চেয়ে একটা ছক তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলো আগেই বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল এবং প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপের জন্য আলাদাভাবে ৩০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় নির্বাচন করা হয়। এর মধ্যে ১৮০টি গ্রামীণ এলাকার ও ১২৯টি শহর এলাকার। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে ২০ জন সমাপনী পরীক্ষার্থী (১০ জন মেয়ে ও ১০ জন ছেলে) দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। এদের জন্য আলাদা একটি প্রশ্নপত্রতৈরি করা হয়। ওই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে জানার চেষ্টা কর হয়, তাদের পড়ালেখা, পরীক্ষার প্রস্তুতি, কেমন পরিবার থেকে তারা আসে, পরিবার স্কুলের খরচ ছাড়া তাদের প্রাইভেট পড়া বা কোচিং-এর জন্য কতটা ব্যয় করতে পারে এমন বিষয়।। যদিও পরীক্ষার্থীরাই ছিল মূল উত্তরদাতা কিন্তু মা-বাবারাও প্রয়োজনমতো তাদের সাহায্য করেছেন। এই শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন পরীক্ষাও নেওয়া

হয়। জরিপের জন্য এমন মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৩৭৫ জন, যাদের মধ্যে মেয়ে ও ছেলের সংখ্যা প্রায় সমান।

গবেষণাকে যথাসম্ভব নির্ভুল করার জন্য তিনটি উপজেলা ও একটি থানায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে কথা বলা হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও তাদের সহকারীবৃন্দ এবং প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষকবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করা হয়েছে। অপরদিকে, বর্তমান ও আগের বছরের পরীক্ষার্থী এবং তাদের মা-বাবার সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনা করা হয়। তা ছাড়াও শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনা পর্যবেক্ষণ করার জন্য অনেকগুলি বিষয় ধরে ধরে জরিপ করা হয়েছে।

গবেষণার বেশিরভাগ তথ্য ২০১৪ সালের পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে তবে অল্প কিছু ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা পুরানো অভিজ্ঞতাও ব্যক্ত করেছেন।

গবেষণার ফলাফল

১. পরীক্ষা পরিচালন পদ্ধতি

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কীভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে তা বোঝার জন্য মাঠ পর্যায়ে এই পরীক্ষা কীভাবে অনুষ্ঠিত হয় তা জানা খুব জরুরি।

- প্রতি বছর পরীক্ষার্থীদের নিবন্ধন শুরু হয় মার্চ-এপ্রিল মাসে আর তা শেষ হয় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে। বিদ্যালয় এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা অফিসসমূহ এ কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে। পরীক্ষার্থীপ্রতি নির্ধারিত নিবন্ধন ফি ৬০ টাকা। কিন্তু সব পরীক্ষার্থী সমপরিমাণ টাকা দেয়নি। শতকরা ৬৪ জন পরীক্ষার্থী নিবন্ধনের জন্য ৬০ টাকাই দিয়েছিল। কিন্তু ৩৪.৩ শতাংশ পরীক্ষার্থীকে এর চেয়ে বেশি টাকা দিতে হয়েছিল।জানা যায় কোন কোন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ ৬০০ টাকা পর্যন্ত দিয়েছিল। অবশ্য তাদের সংখ্যাখুব অল্প। তুলনামূলক বিচারে কিন্ডারগার্টেনগুলো পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিবন্ধনের জন্য বেশি ফি নিয়েছিল।

- প্রতি ইউনিয়নে একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ বিদ্যালয়সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এর জন্য বেছে নেওয়া হয়। পরীক্ষার হল পরিদর্শকদের মূলত নেওয়া হয়েছিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এবং কোনো পরিদর্শককেই তার নিজ ইউনিয়নে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। কিভাবে পরীক্ষা পরিচালিত হবে, তা বোঝার জন্য উপজেলা পর্যায়ে পরিদর্শকদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হয়। প্রতি বিষয়ের জন্য তিন স্তরের পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। এরা হলেন প্রধান পরীক্ষক, সহকারী প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষক। প্রতি ২০০টি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করার জন্য একজন পরীক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। পরীক্ষকদের জন্য সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অনেক পরীক্ষকই জানিয়েছিলেন যে, কাজের চাপ বেশি। তা ছাড়া প্রশাসন থেকে কিছু কঠোর নির্দেশনাও দেয়া হয়। খাতা দেখার জন্য যে টাকা দেয়া হয়, তা নিয়ে অনেকেই অসন্তুষ্ট।

- নিবন্ধনের সময়ই শিক্ষকগণ একটা বিশেষ কৌশল গ্রহণ করেন। তাঁরা এমনভাবে নিবন্ধনের কাজটা করেন, যেটাকে কোনভাবেই সাধু পরিকল্পনা বলা যাবে না। তাঁরা 'দুর্বল' পরীক্ষার্থীদের 'সবলদের' মাঝখানে রেখে তালিকা

তৈরি করে উপজেলা অফিসে পাঠিয়েছিলেন। **উপজেলা অফিস থেকে এর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। পরিদর্শক ও অন্য কর্মকর্তারাওবিষয়টা অনুসরণ করেছিলেন।** এর ফলে পরীক্ষার সময় 'সবলদের' কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে 'দুর্বল' পরীক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ তৈরি করে দেয়া হয়েছিল। হল সুপার ও উপজেলা কর্মকর্তারা ব্যাপারটি জানতেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের করার কিছু ছিল না। পরীক্ষার হলে ছেলে ও মেয়েরা আলাদা বসেছিল। আবার বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার পরীক্ষার্থীরা পৃথক কক্ষে বসে পরীক্ষা দিয়েছিল।

- কিছু ভাল কথা হল, পরীক্ষার সময় বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী (৬০-৬৫ শতাংশ) অপরের সাহায্য ছাড়াই নিজ নিজ পরীক্ষা দিয়েছে। তবে যাদের সাহায্য দরকার ছিল তারা সেটা খুব সহজে পেয়েছে। পরিদর্শকরা পরীক্ষার হলে মুঠোফোন বহন করছিলেন।এসএমএস এর মাধ্যমে হলের বাইরে থেকে প্রশ্নের উত্তর চলে আসছিল। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা প্রশ্নের উত্তর বলে দিয়ে বা বস্ন্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করছিলেন। পরীক্ষার্থীরা যেন একে অন্যের উত্তরপত্র দেখে লিখতে পারে, পরিদর্শকরা সে সুযোগও করে দিয়েছিলেন। যেসব পরীক্ষার্থীর অপরের কাছ থেকে কোনো সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না, তারাও নিজের উত্তরপত্র দেখিয়ে বন্ধুদের সহযোগিতা করছিল। আড়াই ঘণ্টার প্রতিটি পরীক্ষার শেষ ৪০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পুরো পরীক্ষার হলে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় পরীক্ষার্থীরা একে অন্যের সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর মিলাচ্ছিল এবং অনেকে দেখে দেখে লিখছিল।

- পরীক্ষকরা বেশ উদারভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেছেন। এ বিষয়ে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি থেকে যেরকম প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল অনেক পরীক্ষকই বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি এবং এ প্রসঙ্গে তাদের অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করেছেন। কিন্তুপ্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির নিয়ম অনুসরণ করেই উত্তরপত্র তাদের মূল্যায়ন করতে হয়েছে। **পাশের হার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অনেক পরীক্ষার্থীর নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।** সময়স্বল্পতার কারণে উত্তরপত্র মূল্যায়ন পরীক্ষকদের কাছে বাড়তি চাপ মনে হয়েছে। বোধ হয়, সেকারণে কাজটাও মানসম্মতভাবে সম্পন্ন করা যায়নি।

- উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে, তাদের দিক থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। তারা এ জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ও বাংলাদেশ সরকারি ছাপাখানা (বিজি প্রেস)কে দায়ী করেছেন। এরা যথাক্রমে প্রশ্নপত্র তৈরি এবং ছাপানো ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

২. পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে বিদ্যালয়ের উদ্যোগ

- বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু হয় পরীক্ষার্থী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার্থীরা যখন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে তখন থেকেই বিদ্যালয়গুলো এ ব্যাপারে ভাবতে শুরু করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয় ও তাদেরসমাপনী পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হয়। যারা বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো ফল করে না,বিদ্যালয়গুলো তাদের জন্য মা-বাবার কাছ থেকে বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ পাঠানো ও প্রাইভেট টিউটর রাখার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়। কিছু ব্যতিক্রম বাদে, এভাবে প্রায় সব শিক্ষার্থীই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়।

একেবারে শুরুতেই আমরা একটা নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার বিষয়ে যখন সমালোচনার কিছু কিছু কথা শোনা গেছে, তখন অনেকেই বলেছেন যে, আমরা স্বাধীনতার পর প্রথম যে শিক্ষানীতি পেলাম এবং যেটা নিয়ে আমরা বেশ গর্ব অনুভব করি, সেই প্রধান দলিলে তো প্রাথমিক স্তরে সমাপনী পরীক্ষা নেবার কোন কথা নেই। এমনকি শিক্ষানীতি প্রণয়নের সঙ্গে খুব সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন, এমন নামী- দামী ব্যক্তিরাও এই বিষয়টার প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। দেখে নেয়া যাক, শিক্ষানীতিতে কি আছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষার্থী মূল্যায়ন সম্পর্কে নির্দেশনা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে সকল শ্রেণীতে ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু থাকবে। পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/পৌরসভা/থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সকলের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম শ্রেণী শেষে আপাতত জু-নিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা নামে একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে।

একই সঙ্গে আর একটা তথ্যও সকলকে জানানো জরুরি। সার্ক অঞ্চলে বা দক্ষিণ এশিয়ায় উচ্চ- মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাবলিক পরীক্ষা নেবার যে পদ্ধতি প্রচলিত

- বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই বছরের শুরু থেকে কোচিং ক্লাস চালু হয়েছিল। এটি আয়োজন করা হতো বিদ্যালয়ের কর্মঘণ্টার আগে, পরে বা মাঝখানে। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে কোচিং ক্লাস শুরু হয়েছিল ৮৯ শতাংশ সরকারি ও ৭৭.২ শতাংশ নতুন সরকারি বিদ্যালয়ে এবং ৬৫.৬ শতাংশ কিন্ডারগার্টেনে। অপরদিকে, ৬৮.৫ শতাংশ উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ও ৯১.৫ শতাংশ এবতেদায়ি মাদ্রাসায় কোচিং ক্লাস শুরু হয়েছিল জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে। গড়ে বিদ্যালয়গুলো ৭.৩ মাসের জন্য কোচিং ক্লাসের আয়োজন করেছিল– গ্রামের বিদ্যালয়ে ৭.৪ মাস ও শহরের বিদ্যালয়ে ৬.৮ মাস।

- সারা বছরে বিদ্যালয়গুলো গড়ে ৪১২ ঘণ্টার কোচিং প্রদান করেছিল; গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে ৪১৬ ঘণ্টা ও শহরের বিদ্যালয়গুলোতে ৩৮২ ঘণ্টা। বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে, নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এটি ৪৪০ ঘণ্টা, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪২৩ ঘণ্টা, কিন্ডারগার্টেনে ৪১৬ ঘণ্টা, উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬৬ ঘণ্টা ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায় ২২১ ঘণ্টা।

- বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই প্রধানত কোচিং ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কোচিং এর জন্য এলাকায় বেশ নামদাম আছে, এমন শিক্ষকরা অন্য স্কুলে এসে ক্লাস নিয়েছেন। এমন উদাহরণ খুব কম নয়। বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যারা যুক্ত হয়েছিলেন তারা হলেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো শিক্ষার্থী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও এলাকার নামকরা প্রাইভেট টিউটর। গবেষণাভুক্ত বিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকদের দুই-তৃতীয়াংশ ও নারী শিক্ষকদের অর্ধেক কোচিং ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

- মাত্র ২২.৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা দাবি করেছেন যে, তারা কোচিং ক্লাসের জন্য ফি নেন। গ্রামের এক-পঞ্চমাংশ ও শহরের দুই-পঞ্চমাংশের কিছু বেশি বিদ্যালয়ে কোচিং ফি নেওয়া হয়। ফি নেওয়ার দিক থেকে কিন্ডারগার্টেন সবচেয়ে এগিয়ে– ৬৪.২ শতাংশ কিন্ডারগার্টেনে ফি নেওয়া হয় আর সরকারি বিদ্যালয় সবচেয়ে পিছিয়ে– মাত্র ১০.২ শতাংশ। বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নেওয়ার জন্য মাসে শিক্ষার্থীপ্রতি গড় ২০৬ টাকা ব্যয় ছিল। গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ১৮০ টাকা আর শহরের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ২৯০ টাকা। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীপ্রতি মাসে ফি নিয়েছে ২৭৪ টাকা, এবতেদায়ি মাদ্রাসা নিয়েছে ১৭০ টাকা, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ১৫০ টাকা, সরকারি বিদ্যালয় ১৪০ টাকা এবং নতুন সরকারি বিদ্যালয় ৯৩ টাকা।

কোচিং ফি নিচ্ছে এমন বিদ্যালয়ের শতকরা হার

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ প্রধান শিক্ষকের সাক্ষাৎকার, ২০১৪

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষারআর একটা প্রভাব বেশ চোখে পড়ার মত। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মডেল টেস্ট নেয়ার একটা ব্যাপক রেওয়াজ গড়ে উঠে। বিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব উদ্যোগ, কতকগুলো বিদ্যালয় একত্রিত হয়ে

সমন্বিতভাবে এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসেরউদ্যোগে এই টেস্ট আয়োজিত হয়। মডেল টেস্টের উদ্দেশ্য হলো মূল পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং মূল পরীক্ষায়সম্ভাব্য কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তার একটা ধারণা দেওয়া। সঠিক সময়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীরা লিখতে পারছে কিনা বা প্রশ্নের উত্তর খুব সুনির্দিষ্ট হচ্ছে কিনা, ঠিকমত মার্জিন রেখে লেখা হচ্ছে কিনা, সেসব বিচারের একটা ভাল মহড়া হয়ে যায় এর মাধ্যমে। কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে একটু কাঁচা বা কোন বিশেষ অধ্যায় ঠিকমত আয়ত্ত করতে পারেনি, তা-ও বের করার একটা উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু সব বিষয়ে শিশুদের মধ্যে, বিদ্যালয়ের মধ্যে এমনকি উপজেলার মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলে। এর সামাজিক বা শিক্ষাগত প্রভাব খুব ভালো, তা বলা যাবে না।

- সার্বিকভাবে, ৬৩ শতাংশ বিদ্যালয় নিজ উদ্যোগে মডেল টেস্ট আয়োজন করেছিল। ৮৮.৯ শতাংশ বিদ্যালয় অন্য কর্তৃপক্ষ আয়োজিত মডেল টেস্টে অংশ নিয়েছিল। চুয়ান্ন শতাংশেরও বেশি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা উভয় ধরনের টেস্টেই অংশ নিয়েছিল। মডেল টেস্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়নি। একটা বিষয় বেশ বোঝা গেছে। কোচিং এবং মডেল টেষ্টের নামে যে ধরনের আলাদা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের

দেয়া হয়েছে, তাতে শিখনের বিষয়ে কোন গুণগত পরিবর্তন চোখে পড়েনি। বেশির ভাগ সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে অধিকাংশ সময়ই শিক্ষকরা দায়সারা গোছের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কোচিং ক্লাসটা একটু বেশি সময় ধরে নেয়া হয়েছে এই যা। শিক্ষার্থীদের শেখার ব্যাপারে কোন উৎসাহ দানের চেষ্টা ছিল না।

- পড়ালেখার প্রধান উপকরণ ছিল বাজার থেকে কেনা গাইডবই; পাঠ্যবইয়ের ব্যবহারও চোখে পড়েছে। প্রতিদিনের মত কোচিংয়েও শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধভাবে পাঠ দেওয়া হতো। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর জন্য আলাদাভাবে যত্ন পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু ভালো শিক্ষার্থীকে আলাদাভাবে কোচিং দেয়া হয়েছে। শিক্ষকরা মনে করেছেন তারা জিপিএ-৫ পাবে। সেজন্যই এই বাড়তি জোর দেয়া হয়েছে।**তবে কোচিং ক্লাস করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্কুলে নিয়মিত শিক্ষাদানে ঘাটতির ব্যাপার লক্ষ করা গেছে।**

- মডেল টেস্ট দেবার সময় শিক্ষার্থীরা বই ও সতীর্থদের সাহায্য নিয়ে লিখেছে এবং শিক্ষকরা এসব দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করেননি। সবচেয়ে বড় কথা,শিক্ষকরা মডেল টেস্টের উত্তরপত্র ঠিকভাবে দেখেননি। তাঁরা সাদামাটাভাবে উত্তরপত্র সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা তেরি করেছেন এবং এভাবে কিছুটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা অনুসারে সমাধান পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল খুবই নগণ্য। এসব কর্মকা-থেকে সমাপনী পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে বিদ্যালয়গুলো যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। **মোট কথা, পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা মানসম্মত শিক্ষার কোন চিত্র পাওয়া যাবে, এমনটা আশা করা যায়না।**

৩. সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতিতে শিক্ষার্থীদের পরিবারের ভূমিকা

এই গবেষণায় দেখার চেষ্টা করা হয়েছে, বিদ্যালয়ের নেওয়া উদ্যোগগুলোতে শিক্ষার্থীদের পরিবারগুলো কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছে। তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের বিষয়টাও উঠে এসেছে। লেখাপড়ায় পরিবারের সদস্যরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কতটা সাহায্য করতে পেরেছেন, তা-ও কিছুটা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

- সমাপনী পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে পরিবারগুলোর ভূমিকাকে তিনভাবে দেখা যায়। প্রথমত, থেকে বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নেবার ব্যাপারে কতটা সাহায্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্কুলে কোচিং ছাড়াও পরিবারআলাদাভাবে বিশেষ শিক্ষকদের অধীনেপড়ার ব্যবস্থা করেছে। তৃতীয়ত, বাবা- মা, বড় ভাই- বোন বা পরিবারের অন্য কোন সদস্য শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, গড়ে ৮১.১ শতাংশ পরীক্ষার্থী বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নিয়েছিল, ৭৭.১ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নিয়েছিল এবং ৪৭.৪ শতাংশ শিক্ষার্থীকে পরিবারের সদস্যরা পড়িয়েছিলেন।

- গ্রামীণ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা শহরের বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের তুলনায় অধিক হারে বিদ্যালয়ে আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নিয়েছিল (৮৩ শতাংশ ও ৭০.৬ শতাংশ; $p<0.001$) কিন্তু অন্য দুই ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র পাওয়া গেছে। শহরের ৮২ শতাংশ ও গ্রামের ৭৬.২ শতাংশ পরীক্ষার্থীর প্রাইভেট টিউটর ছিল ($p<0.001$) এবং শহরের ৫৪.৩ শতাংশ ও গ্রামের ৪৬.১ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পড়ালেখায় সহায়তা পেয়েছিল ($p<0.001$)।

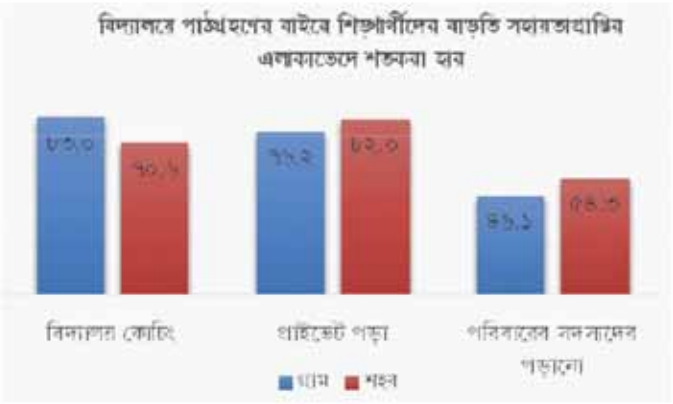

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ

- উপর্যুক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে পার্থক্য পাওয়া গেছে। বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নেওয়া এবং একই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। (যথাক্রমে ৯৩.৩ ও ৬৪.১ শতাংশ); আর প্রাইভেট টিউটরের সহায়তা নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি ছিল (৮০.৩ শতাংশ)। অন্যদিকে, প্রাইভেট টিউটরের সহায়তা নেওয়া ও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে ছিল উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা(যথাক্রমে ৫১.১ ও ৩৮.৯ শতাংশ) ।কিন্তু এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মাদ্রাসায় আয়োজিত কোচিং ছিল সবচেয়ে কম (৬৪.১ শতাংশ)।

বিষয়টি নিচের ছক থেকে ভালভাবে বোঝা যাবে।

টিউটরিং-এর প্রকার	বিদ্যালয়ের ধরন				
	সরকারি	নতুন সরকারি	কিন্ডার-গার্টেন	উপানু-ষ্ঠানিক	এবতেদায়ি মাদ্রাসা
বিদ্যালয় কোচিং	৭৯.৮	৮১.৩	৯৩.২	৭৪.২	৬৪.১
প্রাইভেট পড়া	৮০.৩	৭৮.৫	৬৮.৮	৫১.১	৫৬.৮
পরিবারেরসদস্যদের সহায়তা	৪৬.১	৪৫.৭	৬৪.২	৩৮.৯	৪২.৬

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ

- যেসব শিক্ষার্থী বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নিয়েছিল তাদের অর্ধেক তা বিনামূল্যে পেয়েছিল। যেসব পরীক্ষার্থী বিদ্যালয়ের কোচিং বিনামূল্যে পেয়েছিল এবং যারা ফি-এর বিনিময়ে পেয়েছিল এবং যারা কোনো স্কুল কোচিং নেয়নি – প্রত্যেক অংশেরই বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী অর্থের বিনিময়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছিল। যারা বিনামূল্যে বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ অংশ নিয়েছিল তাদের ৮৩ শতাংশ, যারা বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এর জন্য ফি দিয়েছিল তাদের ৬৯ শতাংশ এবং যারা বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং নেয়নি তাদের মধ্যে ৮২ শতাংশ প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছে। **স্বাভাবিকভাবেই, এজন্য তাদের পরিবারকে বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল।**

- বিদ্যালয়, প্রাইভেট টিউটর এবং পরিবারের সদস্যদের সহায়তা, এই তিনটি উৎস থেকে সম্মিলিতভাবে সমাপনী পরীক্ষার্থীরা সারা বছরে গড়ে ৭৫৪ ঘণ্টার পাঠ নিয়েছিল। যদিও এ ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে কোনো তফাৎ পাওয়া যায়নি, শহর এলাকার পরীক্ষার্থীরা গ্রামীণ এলাকার পরীক্ষার্থীদের তুলনায় বেশি সময় ধরে পাঠ নিয়েছিল (যথাক্রমে ৭৭৫ ও ৭৪৯ ঘণ্টা; $p<0.001$)। বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে, সবচেয়ে বেশি সময়ের জন্য পাঠ নিয়েছিল কিন্ডারগার্টেনের পরীক্ষার্থীরা (৯১০ ঘণ্টা) এবং সবচেয়ে কম পাঠ নিয়েছিল উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা (৩৭৪ ঘণ্টা)। অন্যদের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা ৭৮৩ ঘণ্টার, নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যলয়ের পরীক্ষার্থীরা ৭০৫ ঘণ্টা এবতেদায়ি মাদ্রাসার। পরীক্ষার্থীরা ঘন্টার হিসেবে সবচেয়ে কম সময়ের জন্য (৩৮১ ঘন্টা) ৪ ধরনের সাহায্য পেয়েছিল।

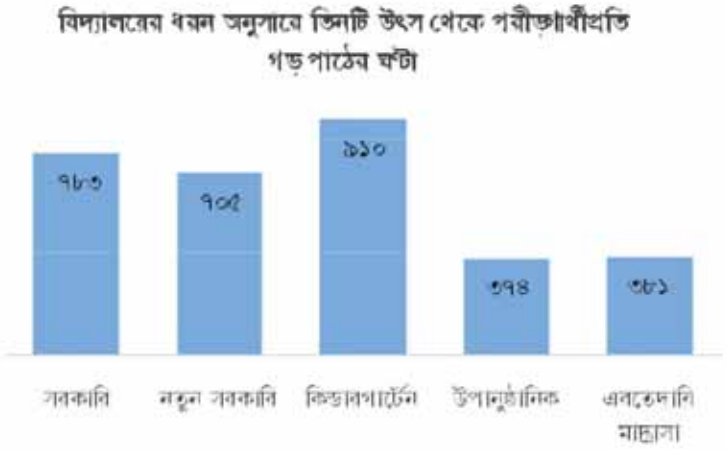

সুত্র: এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ

- মোট পাঠ সময়ের ৫৩.২ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছিল বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ; ৪১ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছিল প্রাইভেট পড়তে এবং ৫.৮ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছিল পরিবারের সদস্যদের কাছে পড়তে। সময়ের এই বিন্যাসটি ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে একই ধরনের পাওয়া গেছে। যদিও গ্রামীণ এলাকার পরীক্ষার্থীরা বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এর জন্য ৫৫.৮ শতাংশ ও পাইভেট পড়ার জন্য ৩৮.৬ শতাংশ সময় ব্যয় করেছিল, শহর এলাকার পরীক্ষার্থীরা ৪০.৩ শতাংশ সময় ব্যয় করেছিল বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এর জন্য ও ৫৩.৭ শতাংশ সময় ব্যয় করেছিল প্রাইভেট পড়তে। সব ধরনের বিদ্যালয়ের

পরীক্ষার্থীরাই প্রাইভেট পড়ার তুলনায় বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এর জন্য বেশি সময় ব্যয় করেছিল। কিন্ডারগার্টেনের পরীক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম– তারা বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ প্রাইভেট পড়ার দ্বিগুণ সময় ব্যয় করেছিল।

পাঠের ধরন অনুসারে মোট পাঠ সময়ের শতকরা বিন্যাস

পরীক্ষার্থী দল	পাঠের প্রকার			মোট
	বিদ্যালয়ের কোচিং	পরিবারের সদস্য	প্রাইভেট পড়া	
সব	৫৩.২	৫.৮	৪১.০	১০০.০
ছেলে	৫৩.৫	৬.০	৮০.৬	১০০.০
মেয়ে	৫৩.১	৫.৬	৪১.৩	১০০.০
গ্রামীণ	৫৫.৮	৫.৭	৩৮.৬	১০০.০
শহুরে	৪০.৩	৬.১	৫৩.৭	১০০.০
সরকারি	৫১.১	৫.৬	৪৩.৩	১০০.০
নতুন সরকারি	৫৩.৮	৫.৭	৪০.৫	১০০.০
কিন্ডারগার্টেন	৬২.৯	৬.৭	৩০.৪	১০০.০
উপানুষ্ঠানিক	৫৭.৫	৭.২	৩৫.৩	১০০.০
এবতেদায়ি মাদ্রাসা	৪৭.৫	১০.০	৪২.৫	১০০.০

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ

৪. প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চোখে সমাপনী পরীক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিস্নষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রয়েছেন পরীক্ষার্থী ও তাদের মা-বাবা, শিক্ষক ও পরীক্ষকরা এবং পরীক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। তাঁরা নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে সমাপনী পরীক্ষা সম্পর্কে এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

- প্রথম বারের মতো এক বিশেষ ধরনের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শিক্ষার্থী ও তাদের মা-বাবার ভেতর একধরনের গর্ব ও তৃপ্তি এনে দিয়েছে। এই পরীক্ষার কারণে তারা ও তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পড়ালেখার ব্যাপারে আগের তুলনায় যত্নবান হয়েছেন। এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি দূর করেছে। **পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সনদপত্র প্রাপ্তি প্রায় প্রত্যেকেই ছোট শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখেছেন।**

- শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন ধরনের চাপ লক্ষ করেছেন যা তাদের মতে সমাপনী পরীক্ষা থেকেই উদ্ভুত। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য এই চাপ বেশ বেশিই ছিল। যে কারণে শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ পড়ছে বলে তারা মনে করেছেন তা হলো, শিক্ষাক্রমের অতিরিক্ত চাহিদা, বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং ও প্রাইভেট পড়া , বিদ্যালয়ে নানা ধরনের

প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা এবং মা-বাবার পক্ষ থেকে ফলাফল সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রত্যাশা।**এমন চাপ প্রতি বছরই বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শিখনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।** ফলে পরীক্ষাগ্রহণের মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে।

- সরকার ও শিক্ষার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যালাভ পরিহার করতে চান। এজন্য সৃজনশীল পদ্ধতির উপর জোর দেয়া হয়েছে।**কিন্তু প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির বেলায় দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরা মুখস্থ বিদ্যায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।** তারা প্রকৃত অর্থে শিখছে না। পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ওপর অধিক মনোযোগ দেবার জন্য অন্যান্য ক্লাসের পড়াশোনায় অবহেলা লক্ষ করা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা গাইড বই এবং কী কী প্রশ্ন এবার আসতে পারে, তা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। শিক্ষক এবং অভিভাবকরাও তার ওপর জোর দেন। স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন থেকেও পরীক্ষার সাফল্যের ওপর জোর দেবার জন্য শিক্ষকরা ভীষণ চাপের মধ্যে থাকেন।

- শিক্ষার মান নিয়ে সমাজে যে ধরনের সচেতনতা থাকা প্রয়োজন, তাতে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। কারণ সকলেই পরীক্ষার জি- পি- এ গ্রেডের বিষয়ে আগ্রহী। **এই পরীক্ষার মাধ্যমে কিন্ডারগার্টেন ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মকা-ের স্বীকৃতি দেওয়ার যে ব্যবস্থা হয়েছে অনেকেই তার প্রশংসা করেছেন।**

৫. পরীক্ষাসম্পর্কে গণমাধ্যমে প্রতিবেদন

সমাপনী পরীক্ষার সময় জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকগুলো নানা ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর মধ্যে রয়েছে খবর, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, বিশেষজ্ঞ মতামত ইত্যাদি। পাঁচটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত এধরনের বিষয়কে এই গবেষণায় পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

- ২০১৪ সালে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সপ্তাহে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবরই ছিল পত্রিকাগুলোতে সবচেয়ে আলোচিত সংবাদ। খবরগুলোর সারমর্ম হলো **পরীক্ষার ছয়টি বিষয়ের প্রতিটির প্রশ্নপত্রই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চল থেকে ফাঁস হয়েছে।** ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে ফেইসবুক ও ইমেইলকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়াও এ ব্যাপারে কোচিং সেন্টারের তৎপরতার কথাও পত্রিকাগুলোতে এসেছে।

- এই অপতৎপরতার সঙ্গে জড়িতদের পাকড়াও করতে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মতৎপরতার কথাও পত্রিকাগুলোতে ছাপা হয়েছে। পত্রিকার প্রতিবেদকরা দেখেছেন যে, **পরীক্ষার হলে শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে লিখে দিচ্ছেন এবং ভুয়া পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে।** বেশ কয়েকজন শিক্ষক, ভুয়া পরীক্ষার্থী ও কোচিং সেন্টারের লোকজনকে ধরা হয়েছে, জেলে পাঠানো হয়েছে ও জরিমানা করা হয়েছে।

- বেশ কটি প্রতিবেদনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ও বাংলাদেশ সরকারের প্রেসের (বিজি প্রেস) দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বেশিরভাগ প্রতিবেদনেই **প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য সরকারি সংস্থাগুলোকে দোষারোপ করা হয়েছে** এবং এ ধরনের একটি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও কাজের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

- **গণমাধ্যম লক্ষ করেছে যে, মাননীয় মন্ত্রীরাসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা সবাই উচুঁ গলায় দাবি করেছেন যে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোন ঘটনা ঘটেনি।** এদেঁর মধ্যে

অনেকেই পত্রিকায় প্রকাশিত খরবগুলোকে অসত্য, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সন্দেহজনক, বিভ্রান্তিকর, গুজব ইত্যাদি বলে অভিহিত করেন। এক ধরনের আইনি অবস্থান থেকে মন্ত্রণালয়গুলো দাবি করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না জেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা কোনো প্রকার পদক্ষেপ নেবেন না। তাদের কেউ কেউ অবশেষে বলেন, পরীক্ষার আগে যে প্রশ্নগুলো বেরিয়ে এসেছে তা আসলে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দেওয়া সাজেসন্স এবং কাকতালীয়ভাবে এগুলো মূল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে গেছে। যেহেতু এ ধরনের সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাজে গাফিলতি এবং অদক্ষতার ব্যাপার তুলে ধরা হয়েছে, তাই সরকার জোর গলায় তা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন।

২২২২

- খবরের কাগজগুলোতে এ ব্যাপারে সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলোর মূল বক্তব্য হল, সর্বজনীন পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছে। এসব লেখায় প্রশ্নপত্র প্রকাশসহ পরীক্ষাসংক্রান্ত নানা কাজে অসদুপায় অবলম্বনের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়। সংবাদপত্রগুলো অভিমত দেয় যে, এই পরীক্ষার নানা অনিয়ম প্রকাশ হবার ফলে শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সমাজে এক ধরনের অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হচ্ছে।

- সমাপনী পরীক্ষা শুরুর দিন ও ফলাফল প্রকাশের পরদিন সংবাদপত্রগুলো গুরুত্বসহকারে এ সংক্রান্ত খবর পরিবেশন করে। পত্রিকাগুলোতে ফলাফলের নানা ধরনের বিশ্লেষণও ছাপা হয়েছে। সেরা বিদ্যালয়, সবচেয়ে ভালো ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থী, ফলাফলে গ্রাম-শহরের বিভাজনসম্পর্কে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে এবং ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের উৎফুলস্ন ছবিও প্রকাশিতহয়েছে।

৬. সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ও এর সঙ্গে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের সম্পর্ক

সমাপনী পরীক্ষা ২০১৪-এ শিক্ষার্থীদের সার্বিক অর্জন কেমন হয়েছে, এই গবেষণায় তা সমীক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে। ছেলে শিশু-মেয়ে শিশু, এলাকা, বিদ্যালয়ের ধরন ও পরিবারসমূহের সামাজিক অবস্থা এবংসার্বিক সামর্থ্য বিবেচনার মধ্যে নেয়া হয়েছে। সমাপনী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অর্জনের সঙ্গে প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের সম্পর্কও দেখা হয়েছে।

- সার্বিকভাবে, ১০.৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট গড় বা জিপিএ ৫ পেয়েছে, ৪৩.৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী জিপিএ ৪ বা তার বেশি পেয়েছে, ৭৫.৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী জিপিএ ৩ বা তার বেশি পেয়েছে, ৯৩.৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী জিপিএ ২ বা তার বেশি পেয়েছে এবং ৯৯.১ শতাংশ পরীক্ষার্থী জিপিএ ১ বা তার বেশি পেয়েছে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরীক্ষার্থীর জিপিএ ছিল ৪ থেকে ৫ এর মধ্যে, আরেক তৃতীয়াংশের জিপিএ ছিল ৩ থেকে ৪ এর মধ্যে– এই দুই-এ মিলে মোট ৬৪.৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী।

- শুধু পাশের হারের (জিপিএ ১ বা তার বেশি) পরিসংখ্যানটি বিবেচনায় নিয়ে**সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে জেন্ডার, এলাকা ও বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়নি**।এর কারণ, প্রায় সব পরীক্ষার্থীই পাশ করেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, জিপিএ ৫, ৪+, বা ৩+ অর্জনের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে এবং শহরের পরীক্ষার্থীরা গ্রামের পরীক্ষার্থীদের তুলনায় ভালো করেছে। মাপকাঠি হিসেবে জিপিএ ২+ কে গ্রহণ করলে এ ধরনের পার্থক্য বেশ কম। বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে**কিন্ডারগার্টেন সবচেয়ে ভালো করেছে তারপরই উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের স্থান**। ধারাবাহিকভাবে রয়েছে যথাক্রমে সরকারি বিদ্যালয়, এবতেদায়ি মাদ্রাসা ও নতুন সরকারি বিদ্যালয়।

জিপিএ প্রাপ্তি, জেন্ডার ও এলাকা অনুসারে পরীক্ষার্থীদের শতকরা বিন্যাস

জিপিএ	জেন্ডার		এলাকা		সব
	ছেলে	মেয়ে	গ্রাম	শহর	
৫	৯.৫	১১.৭	৮.১	২৩.৩	১০.৬
৪+	৪১.৮	৪৪.৬	৩৯.০	৬৪.৯	৪৩.৩
৩+	৭১.৫	৭৯.৪	৭৩.১	৮৭.৩	৭৫.৫
২+	৯২.৪	৯৪.৬	৯২.৭	৯৭.৪	৯৩.৫
১+	৯৮.৮	৯৯.৪	৯৯.০	৯৯.৫	৯৯.১
০+	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ

জিপিএ প্রাপ্তি ও বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে পরীক্ষার্থীদের শতকরা বিন্যাস

জিপিএ	বিদ্যালয়ের ধরন				
	সরকারি	নতুন সরকারি	কিন্ডার-গার্টেন	উপানু-ষ্ঠানিক	এবতেদায়ি মাদ্রাসা
৫	৯.১	৩.০	৪০.৬	৪.১	০.৭
৪+	৪৪.০	২২.৮	৮৪.৮	৪৯.২	২০.১
৩+	৭৭.০	৬০.৯	৯৭.০	৮৩.০	৬৫.৪
২+	৯৫.১	৮৬.৪	৯৮.৮	৯৭.২	৮৯.৯
১+	৯৯.৬	৯৭.৯	৯৯.৬	৯৯.২	৯৫.৫
০+	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ,

বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে জিপিএ ৩.৫ বা তার বেশি পেয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের শতকরা হার

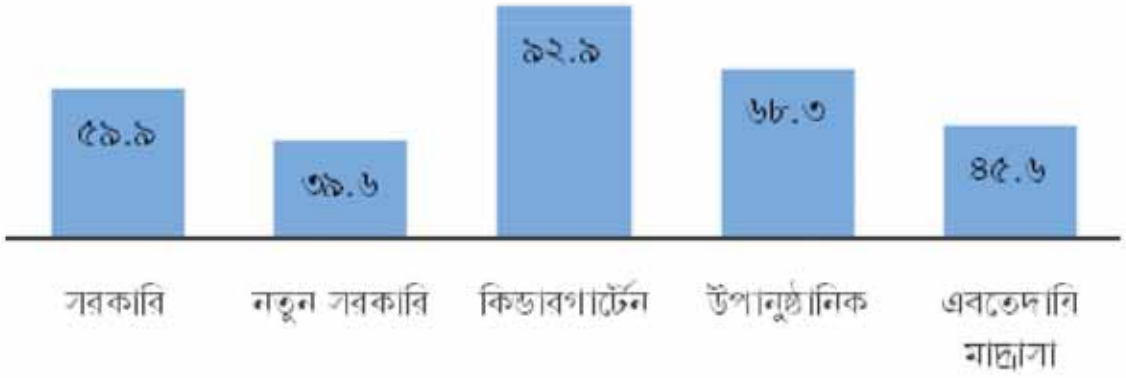

সূত্র: এডুকেশন ওয়াচ ২০১৪ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী জরিপ

- সার্বিকভাবে, ভাষার ক্ষেত্রে (বাংলা ও ইংরেজি উভয়ই) পরীক্ষার্থীরা উলেস্নখযোগ্য রকম খারাপ ফল করেছে। **ইংরেজিতে ৪২.৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী গ্রেড সি অথবা ডি পেয়েছে। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও আরবিতে খুব খারাপ ফল**

করেছে। ইংরেজি বাদে আর সব বিষয়েই সর্বোচ্চ সংখ্যক পরীক্ষার্থী সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়েছে (এ+ বা গ্রেড পয়েন্ট ৫)। আলাদাভাবে, বাংলায় ২৭.৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী, গণিতে ৪১ শতাংশ পরীক্ষার্থী, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ে ৩৫.৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী, প্রাথমিক বিজ্ঞানে ৩৮.৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় ৫৭.৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী এ+ পেয়েছে ।

- পরীক্ষার্থীদের পরিবারের সামাজিক অবস্থান এবং আর্থিক সামর্থ্য গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে। এমন একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার্থী প্রতি পরিবারের ব্যয়বিচার করলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে free বলে গণ্য করা যাবে না। এই পরীক্ষার ফলাফলকে ব্যাখ্যা করার জন্য কয়েকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

- পরিবারের দিক থেকে খরচ
- কীধরনের স্কুল: সরকারি, নতুন সরকারি, কিন্ডারগার্টেন, উপানুষ্ঠানিক এবং এবতেদায়ি মাদ্রাসা
- মাতাপিতার শিক্ষা
- একজন পরীক্ষার্থী কত ঘন্টা প্রাইভেট পড়ছে

- পড়াশোনায় পরিবার থেকে কেমন সাহায্য পাওয়া যায়
- ছেলেশিশু- মেয়েশিশু
- শহর না গ্রাম
- নিয়মিত ক্লাসের অতিরিক্ত বিদ্যালয়ে কতটা সময় কোচিং করানো হয়।

- যে পরীক্ষার্থীর শিক্ষার জন্য যত বেশি অর্থব্যয় করা হয়েছে এবং যার মা-বাবা যত বেশি পড়ালেখা করেছে সে সমাপনী পরীক্ষায় তত ভালো করেছে। আবার, মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এবং শহরের শিক্ষার্থীরা গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় উলেস্নখযোগ্যভাবে ভালো ফল করেছে।

৭. ব্যক্তিখাতে শিক্ষা ও অতিরিক্ত পাঠের ব্যয়

- গড়ে সারা বছরে পঞ্চম শ্রেণির একজন পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয় ছিল ৮,২১২ টাকা। এই গড় হিসাবটাই সাধারণ ভাবে বড় অঙ্কের একটা টাকা। কিন্তু হতচকিত হবার মত তথ্য হল, এটাই যে একজন পরীক্ষার্থীর জন্য সবের্চ্চাচ ব্যয় পাওয়া গেছে ৭৭,৪৫০ টাকা, যা মাসের হিসেবে দাড়াঁয় প্রায় সাড়ে ছয় টাকা। আবার একজনের জন্য সর্বনিম্ন ব্যয়টাও আমদের ব্যথিত করে। তা হল বছরে ৫০ টাকা অর্থাৎ মাসে ৪ টাকার সামান্য বেশি। এ ক্ষেত্রে যদিও ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পাওয়া যায়নি,কিন্তুগ্রামের একজন পরীক্ষার্থীর জন্য গড়ে যে পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছিল শহরের একজন পরীক্ষার্থীর জন্য লেগেছিল তার দেড় গুণেরও বেশি।

Classroom-1

- ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে পার্থক্য লক্ষ করা গেছে। কিন্ডারগার্টেনের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যয় সবচেয়ে বেশি এবং উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা সবচেয়ে কম। দ্বিতীয়টির তুলনায় প্রথমটি ছয় গুণেরও বেশি। কিন্ডারগার্টেন পরীক্ষার্থীদের গড় বাৎসরিক খরচ নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের গড় বাৎসরিক খরচের তিন গুণেরও বেশি আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের খরচের প্রায় আড়াই গুণ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের গড় খরচ ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের গড় খরচের আড়াই গুণ।

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত খাতসমূহে মোট খরচের ৫৮.৭ শতাংশ অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি খরচ হয়েছে প্রাইভেট পড়তে, ১৭.৪ শতাংশ বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিং-এ, ৩.২ শতাংশ পরীক্ষাসংক্রান্ত যাতায়াতে, ২.১ শতাংশ মডেল টেস্টে, ১.৯ শতাংশ পরীক্ষার জন্য নিবন্ধনে, ০.৯ শতাংশ কোচিং/প্রাইভেট পড়ার যাতায়াতে এবং ০.৮ শতাংশ নিবন্ধনের ছবি তোলার জন্য। খরচের দিক থেকে প্রাইভেট পড়ার খরচ বিদ্যালয়ের কোচিং-এর খরচের তুলনায় অনেক বেশি। বিদ্যালয়ে কোচিং করার চেয়ে আলাদা করে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ার খরচ প্রায় সাড়ে তিন গুণ বেশি।

  সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির সহায়ক হিসেবে ৯৬.৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী গাইডবই, সাজেসন্স বা হাতে তৈরি নোট কিনেছে। এ কাজে তারা গড়ে ৫৯৪ টাকা খরচ করেছে। এই খরচ পঞ্চম শ্রেণির মোট শিক্ষাব্যয়ের ৭.২ শতাংশ এবং সমাপনী পরীক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ের ১৫ শতাংশ। ব্যক্তিখাতে ২০১৪ শিক্ষাব্যয় ২০০০ সালের তুলনায়তিন গুণের বেশি।

ঘ. গবেষণা থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

- **পরীক্ষা-কেন্দ্রিক শিক্ষা ও পড়া মুখস্থ করা এক কঠিন বাস্তবতাঃ** সমাপনী পরীক্ষা প্রচলন করার পর থেকে প্রাথমিক বিদ্যলয়ের শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, বিশেষকরে পঞ্চম শ্রেণিতে। এটা খুবই নেতিবাচক একটা প্রবণতা। কিন্তু তা দিন দিন বাড়ছে। পরীক্ষার্থীদের তৈরি করার জন্য

দলবদ্ধ কোচিং ও মডেল টেস্ট বিদ্যালয়গুলোর প্রধান কর্মকা- পরিণত হয়েছে। **এসবের প্রসারে উপজেলা শিক্ষা অফিসও যুক্ত রয়েছে।** প্রতিটি শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকের আলাদাভাবে সংযোগ না ঘটায় অন্যান্য শিক্ষার্থীদের মৌলিক শিখণ প্রয়োজন মিটছে না। মুখস্থ করা পড়ালেখার প্রধান উপায় হয়ে উঠেছে; বিষয়বস্তু অনুধাবন করার কোন তাগিদ নেই, শিক্ষার্থীদের নেই, শিক্ষকদের নেই এমনকি পরিবারেরও নেই। সৃজনশীল পড়াশোনার সর্বনিম্ন চাহিদাও পূরণ হচ্ছে না।

- **প্রাইভেট পড়ার ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে:** শিক্ষার্থীরা ও তাদের মা-বাবারা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পড়ালেখা এমনকি বিদ্যালয় আয়োজিত কোচিংয়ের ওপর ভরসা করতে পারছেন না। এর ফলে সকল ধরনের বিদ্যালয়ের এবং গ্রাম-শহরে সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাইভেট পড়ার প্রতি ঝোঁক উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। প্রাইভেট শিক্ষকদের উলেস্নখযোগ্য এক অংশ হলো নিজ বিদ্যালয়েরইশিক্ষকরা।এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশ। সেখানেও**যে শিক্ষার্থী তার কাছে প্রাইভেট পড়ে, শিক্ষক তার প্রতি বাড়তি নজর দেন অথবা তিনি ক্লাসে খুব দায়সারাভাবে পাঠদান করেন।** যে পরীক্ষার্থীরা নিজ বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে আয়োজিত কোচিংয়ে অংশ নেয় তারাও টাকা খরচ করে প্রাইভেট পড়ে।

- **গাইডবই পাঠ্যবইকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে:** বেশিরভাগ শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রাইভেট টিউটরের কাছে **গাইডবই হলো পড়ালেখা করার প্রধান এবং অনেক ক্ষেত্রেই একমাত্র উপকরণ**। দেখা গেছে, একজন শিক্ষার্থীর কাছে একটি বিষয়ের জন্য একাধিক প্রকাশনীর গাইডবই রয়েছে। গাইডবইয়ের প্রধান আকর্ষণ হলো, পরীক্ষায় আসতে পারে এমন প্রশ্নের তৈরি উত্তর সেখানে পাওয়া যায়। এবং নিজ থেকে উত্তর তৈরি করার চেষ্টা না করে সহজেই মুখস্থবিদ্যা চর্চা করা যায়। বিগত ছয় বছরে এ ধরনের প্রবণতা দিনের পর দির বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **অসদুপায় অবলম্বন ও অনৈতিকতা শিখতে শিক্ষার্থীরা প্ররোচিত হচ্ছে:**দিনরাত পড়াশোনার চাপে বেসামাল হয়ে শিশু শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়। মা- বাবারাও প্রবল চাপের মধ্যে থাকেন। তারপরও পরীক্ষার হলে অসৎ উপায় অবলম্বনের সুযোগ ওই প্রস্তুতিকে ভেঙ্গে দেয়। বেশি নাম্বার পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। তাই দেখা যায়, পরীক্ষার্থীদের একটি অংশ শিক্ষক ও পরীক্ষা পরিচালনাকারীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তায় যে কোনো মূল্যে অধিক নম্বর পেতে সচেষ্ট। **এরা অনেকেই পরীক্ষার হলের বাইরে প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ অসদুপায় অবলম্বন করা ও যথাযথ আচরণ না করার সঙ্গে জড়িত।শিক্ষা অফিস, বিদ্যালয়, পরীক্ষার হল, কোচিং সেন্টার সবাই এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত**। পরীক্ষার্থীদের একটি অংশের বাধাহীন অসদুপায় অবলম্বন ও নকল করার প্রায় অবাধ সুযোগ পুরো শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে হাস্যকর করে তুলেছে। এসব বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলকব্যবস্থা না নেওয়ায়শিক্ষার্থীরা শৈশব থেকেই অন্যায় ও অনিয়মকে সামাজিক বাস্তবতা বলে গণ্য করতে শিখেছে।

- **বিদ্যালয়ে পাঠদান অবৈতনিক হ'লেও প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যের নয়, বরঞ্চ উচ্চ মূল্যের:**দিনের পর দিন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পরিবারের ব্যয় অনেক বেড়েছে। পড়ার জন্য কোন বেতন দিতে হয় না। পাঠ্যবইও সরকার বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু অন্যান্য যেসব খাতে পরিবারকে খরচ করতে হয়, সেটাও অনেক গরিব বা সাধারণ পরিবারের জন্য বহন করা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার জন্য এই খরচটা আবার অনেকটা বেড়ে গেছে।

- **পুরো ব্যবস্থাজুড়ে রয়েছে চোখে পড়ার মত বৈষম্য বিরাজমান:** বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয়ের ধরন, গ্রাম-শহর, জেন্ডার, শিক্ষার্থীদের আর্থসামাজিক পটভূমি, ব্যক্তিখাতে শিক্ষাব্যয় ইত্যাদিসর্বত্রই দেখা যায় নানারকম বৈষম্য। নতুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা সবচেয়ে খারাপ করেছে, যেমন খারাপ করেছে এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও।

উপসংহার

- সমাপনী পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার প্রতি অধিকতর যত্নবান হতে চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছে। শিক্ষার্থী, তাদের মা-বাবা ও শিক্ষকদের শিক্ষা বিষয়ে অধিকতর সচেতন করে তুলেছে।

- অবশ্য এর জন্য বেশ কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে।এই গবেষণা থেকে বোঝা যায়,বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা 'শিখন-কেন্দ্রিক' না করে অধিকতর 'পরীক্ষা-কেন্দ্রিক' হয়ে উঠেছে।এর ফলে শিশুরা শেখার আনন্দ ও সৃজনশীল হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সমাপনী পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শিখন পরিমাপ করা ও প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় ধরনের এক উদ্যোগ– সরকারের এধরনের প্রত্যাশা অর্জনের দিক থেকে কতটা পূরণ হচ্ছে, সে বিষয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে।

- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের শিখনের মূল্যায়ন বিষয়ে একটা বির্তকের জন্ম দিয়েছে। শিক্ষার মান বাড়ছে না, কিন্তু শিক্ষার্থীদের পাশের হার প্রায় একশত ভাগের কাছাকাছি। এই বিষয়টা স্বাভাবিকভাবেই ভাবিয়ে

তোলে। প্রশাসনের নির্দেশে খাতা দেখা হচ্ছে, এমন অভিযোগ উঠেছে। এটা কোন ভাল লক্ষণ নয়। সরকার ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনকে এই বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যেন বাধ্যতামূলকভাবে সারা বছর প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতে নিয়মিত রুটিন অনুসরণ করে শ্রেণির কাজ পরিচালনা করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বিদ্যালয়ভিত্তিক কোচিং কেবলমাত্র পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে থাকতে পারে। কোনোভাবেই সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির নামে মুখস্থ বিদ্যাকে একমাত্র হাতিয়ার করা যাবে না।

- পড়া, লেখা ও গণিতের শ্রেণিভিত্তিক মৌলিক দক্ষতাবাড়ানোর জন্য অধিকতর সময় দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। সার্বিকভাবে, ক্লাসের সময় বাড়ানো দরকার এবং সেটা যাতে ধীরে ধীরে আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীত হয়, সেজন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

- বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার চরিত্র খুবই প্রতিযোগিতামূলক। এটা প্রায় অস্বাস্থ্যকর ও দৃষ্টিকটু।বিষয়টা সামগ্রিকভাবে খুবইউদ্বেগের।এমন একটা সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেসমাপনী পরীক্ষার সংস্কার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে

হবে।তাই পরীক্ষার সময় অসদুপায় ও অনৈতিকতার উদাহরন সৃষ্টি হয়, তা দূর করতে হবে।নিবন্ধনের সময় থেকেই নানা অনিয়ম ও অসাধু কৌশলের বিষয় আমাদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। এসবের প্রতিকার প্রয়োজন। তাছাড়া পরীক্ষার প্রকৃত মূল্যায়নের পাশাপাশি পরীক্ষাসম্পর্কিত নিয়মকানুন ও বিধি-বিধান সংস্কার করতে হবে।

- জাতীয়শিক্ষানীতি ২০১০ গ্রহণ করার পর ধর্মশিক্ষার সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাও যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই পরীক্ষাব্যবস্থাই অনৈতিকতার বড় ও বাস্তক উদাহরণ। এ বিষয়টা প্রতিরোধের জন্য অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন ও সরকার সব পর্যায় থেকেই দ্রুন্নত ও ব্যাপক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

- শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষককেও শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে রাখতে হবে।শিক্ষার্থীদের শিখনের প্রাত্যহিক ও সমাপনী মূল্যায়ন শিক্ষকদের অন্যতম প্রধান কাজ। শিক্ষার্থী মূল্যায়নের পদ্ধতিতে 'প্রাত্যহিক' ও 'সমাপনী' উভয় ধরনের মূল্যায়নের স্থান থাকা দরকার এবং শিক্ষকরা যেন তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারেন তার যথাযথ পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার।

- সমাপনী পরীক্ষার ব্যবস্থাপনাকে সহজ করার লক্ষ্যে এটিকে উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা দরকার। যার মধ্যে রয়েছে, প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা পরিচালনা, উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশ করা। জাতীয় শিক্ষানীতিতে

পঞ্চম শ্রেণিতে উপজেলাভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়ার এ ধরনের একটি প্রচেষ্টা তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। শেষ পর্যন্ত, উপজেলা শিক্ষা অফিসসমূহকে সংগঠিত ও দক্ষ মানবসম্পদ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে।এর মাধ্যমে স্বাধীনভাবে সমাপনী পরীক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত কাজ করা সম্ভব হবে। যদিও, স্থানীয় সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহযোগিতা ও তদারকির ভূমিকাথাকবে।

- দেশে প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে প্রায় আড়াই দশক আগে। কিন্তু শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি রয়ে গেছে পুরানো ধাঁচে। সমাপনী পরীক্ষাকে ক্রমান্বয়ে প্রান্তিক যোগ্যতাভিত্তিক করার একটা উদ্দেশ্য তৃতীয় প্রাথ মিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে (পিইডিপি ৩) রয়েছে। কাজটি শুরু হয়েছে, এটা দ্রুত সম্পন্ন করা দরকার। উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ এ ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না। উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে।

- *শিক্ষাসংশিষ্টসবধরনের ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন:* ইতোমধ্যে ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং

ছয়টি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ছয় বছরে প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিস্নষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান যেমন, পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, পরীক্ষার্থীর মা-বাবা ও অভিভাবক, বিভিন্নস্তরের শিক্ষা কর্মকর্তাগণ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সমাপনী পরীক্ষার ওপর অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। এছাড়াও শিক্ষাবিদ, গবেষক, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন সময়ে মতামত তুলে ধরেছে। তার ভিত্তিতে আর দেরি না করে সংস্কার কার্যক্রম হাতে নেয়া যেতে পারে।

- সমাপনী পরীক্ষার সূত্র ধরে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করতে হবে। শিক্ষা প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া তা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। শিক্ষায় প্রয়োজনীয় এবং অধিকতর বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

সহযোগীতায়
সিভিল সোসাইটি এডুকেশন ফান্ড (সিএসইএফ)